নয়। পরমাণু বিষয়ক কিছু সুবিধার বিনিময়ে সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। অথচ ভারত তাই করতে চলেছে।

ষষ্ঠত, বামদলগুলি আর-একটি মারাত্মক অভিযোগ এনেছে। ১২৩ চুক্তির উদ্দেশ্য কেবল ভারতকে পরমাণুশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাহায্য করা নয়, ভারতের প্রতিরক্ষার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তথ্যাদি সংগ্রহ করা, ইরানের সঙ্গে ভারত কী সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় সেটাই চুক্তির আওতায় আসবে না। অন্যান্য দেশের সঙ্গে তার বিদেশনীতির বিষয়টি এর অন্তর্ভুক্ত হবে যার ফলে ভারত তার স্বাধীন বিদেশনীতি তৈরির সুযোগ হারাবে (The Hyde Act has set a certain direction to the US administration to see that India comes on board on certain of their key foreign policy interests. Iran being the most important ..... In the civilian nuclear cooperation discussions in the US Congress, the US administration made a big pitch saying that this was not only about nuclear commerce, but also about stakes in defence acquisition.)। সমালোচকদের আশঙ্কা হল ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং প্রতিরক্ষা বিষয়ে গোপনীয় বলতে কিছু থাকবে না। একে অনেকে ভয়ংকর বলে মনে করেন। তাই বলা হয়েছে : The Americans are more interested in the larger strategic tie-up and nuclear cooperation is one way to cement this.[১]

কিয়োটো প্রোটোকল, বিশ্বউষ্মায়ন ইত্যাদি[২]

কিয়োটো প্রোটোকল কী?

বিশ্বের মানবজাতি এবং সমগ্র পরিবেশকে সকলপ্রকার দূষণের অভিশাপ থেকে রক্ষা করার জন্য গত শতকের আটের দশক থেকে রাষ্ট্রসংঘকে বিশেষভাবে তৎপর হতে দেখা যায় কারণ এই সংগঠন বুঝতে পারে যে পরিবেশের ক্রমাবনতি কোনো একটিমাত্র দেশের সমস্যা নয় এবং সে-কারণে পরিবেশকে মানবজাতির কল্যাণোপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে একটি সার্বিক ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে ১৯৯২ খ্রি.-এ ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হয় যা ১৮৬টি দেশের দ্বারা অনুসমর্থিত (ratified)। কিন্তু এর খুঁটিনাটি বিষয়গুলি রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে স্থির হয়নি। ১৯৯৭ খ্রি.-এ জাপানের কিয়োটো শহরে আর-একটি সম্মেলন বসে যা কিয়োটো প্রোটোকল (Kyoto Protocol) নামে পরিচিত। ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ নামক ঘোষণাপত্রে ১৮৬ টি দেশ সমর্থন জানিয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘ ঘোষণা করলেও জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত কোনো প্রস্তাব কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ১৯৯৭ খ্রি.-এর ১১ ডিসেম্বর কিয়োটো প্রোটোকল তৈরি হয় যার উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করা। সুতরাং কিয়োটো প্রোটোকল হল বিশ্বকে পরিবেশদূষণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য রাষ্ট্রসংঘ অনুমোদিত একটি সম্মেলন এবং ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর তৃতীয় অধিবেশন। এ পর্যন্ত ১৭৪টি দেশ এই কিয়োটো প্রোটোকল-এ স্বাক্ষর করেছে।

কিয়োটো প্রোটোকল-এর উদ্দেশ্য

ইউ.এন.ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর লক্ষ্যগুলিকে সামনে রেখে কিয়োটো প্রোটোকল তার লক্ষ্য স্থির করেছে। এর উদ্দেশ্যগুলি হল : (১) বিশ্বকে দ্রুত অগ্রসরমান উষ্মায়নের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা। কারণ উষ্মায়ন দিনের পর দিন এমন দ্রুততার সঙ্গে বেড়ে চলেছে যে—এর গতিরোধ করতে না পারলে চরম সংকট দেখা দিতে বিলম্ব ঘটবে না।

(২) উষ্মায়ন থেকে বিশ্বকে বাঁচাতে হলে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ রোধ করতে হবেই। কিয়োটো প্রোটোকল বলে দিয়েছে যে ১৯৯০-তে গ্রিনহাউস গ্যাস যে স্তরে ছিল ২০১২ খ্রি. নাগাদ সেই গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ ৫·২ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে।

(৩) কিয়োটো প্রোটোকল মনে করে যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণকে সহনশীলতার স্তরে বন্দি করে রাখতে হলে দরকার সকল উন্নত দেশকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সাবধানতা অবলম্বন করা।

(৪) কিয়োটো প্রোটোকল-এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে সারা বিশ্বের উত্তাপ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা বন্ধ না করতে পারলে পরিবেশের এমন অবনতি ঘটবে যে বিশ্ব ধ্বংসের

[১] Frontline, July 18.2008. p. 10.

বি. দ্র. : এই আলোচনায় ব্যবহৃত তথ্যাদি বিভিন্ন পত্রিকা ও ম্যাগাজিন থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

[২] উন্নয়ন ও পরিবেশ শীর্ষক আলোচনায় বিশ্ব উষ্মায়ন, দূষণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি নিয়ে আমি আগে আলোচনা করেছি। কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এদের সম্পর্কে সাম্প্রতিক তথ্য উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সংযোজন বা পরিশিষ্ট অংশে বাড়তি তথ্য দিলাম। কিয়োটো প্রোটোকল-এর সঙ্গে বিশ্ব উষ্মায়নের সম্পর্ক তো রয়েছে। আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা আশা করি পুনরালোচনা থেকে তাদের তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলতে সক্ষম হবে।

দিকে অগ্রসর হবে এবং তা রোধ করার একমাত্র উপায় হল গ্রিনহাইস গ্যাসের নিঃসরণ দ্রুত কমিয়ে ফেলা।

(৫) কিয়োটো প্রোটোকল রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে আনার কথা বলে না। প্রোটোকল জোর দিয়ে বলেছে যে প্রতিটি রাষ্ট্র সমগ্র পরিস্থিতি সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারবে এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ব্যবস্থা নেবে।

কিয়োটো প্রোটোকল ও উন্নত দেশের ভূমিকা

কিয়োটো প্রোটোকল-এ যেসমস্ত দেশ স্বাক্ষর করেছিল বা এর প্রতি অনুসমর্থন জানিয়েছিল তাদেরকে দুটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি হল উন্নত দেশ এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশ যারা উন্নয়নশীল অনুন্নত ইত্যাদি নামে পরিচিত। বিশ্বের মোট ৩৬টি দেশ প্রথম গোষ্ঠীতে পড়ে। এদের মধ্যে আছে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ ইউরোপীয় সংঘের সকল দেশ। জাপানও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ২০০৭ খ্রি.-এর মে মাসের ১৪ তারিখে কলকাতা থেকে প্রকাশিত টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় একটি প্রতিবেদন বের হয় এবং সেই প্রতিবেদনে দেখা যায় যে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ক্ষেত্রে আমেরিকার স্থান সারা বিশ্বে দ্বিতীয়। উল্লেখ্য যে ১৯৫০ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত সময়ে নানা দেশ যে পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করেছে তার একটি গড় হিসাব নেওয়া হয়েছে। এই হিসাব অনুসারে আমেরিকা দ্বিতীয় স্থানে। ৮নং স্থানে রয়েছে জার্মানি। ইউরোপীয় সংঘের সদস্যসংখ্যা ২৫। তাদের সম্মিলিত 'অবদান' হল ২৪নং স্থান। রাশিয়ার স্থান ১১নং।

কোন্ দেশ কী পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস ২০০৩ খ্রি.-এ নিঃসরণ করেছিল তার একটি হিসাব আমরা ওই প্রতিবেদন থেকে পাচ্ছি।

দেশের নাম	স্থান (Rank)
কাতার (Qatar)	১
কোয়েত (Quwait)	২
সংযুক্ত আরব আমিরশাহি	৩
লুক্সেমবার্গ	৪
বাহ্‌রিন	৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৬
ত্রিনিদাদ (Trinidad)	৭
ব্রুনেই (Brunei)	৮
কানাডা	৯
অস্ট্রেলিয়া	১০
ভারত	১২০

প্রতিবেদন মতে এই হিসাব হল মাথাপিছু নিঃসরণের পরিমাণ।

১৯৫০ থেকে ২০০৩-এর মধ্যে আমেরিকা ভারতের চেয়ে ১০ গুণ বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করেছিল এবং ইউরোপীয় সংঘ করেছিল ৮·৫ গুণ বেশি। অস্ট্রেলিয়াও পিছিয়ে ছিল না। অথচ পরিতাপের বিষয় হল আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া এই দুটি দেশ কিয়োটো প্রোটোকল-এ স্বাক্ষর করতে চায়নি। ২০০১ খ্রি.-এ জর্জ বুশ রাষ্ট্রপতি হয়েই যে কাজটি প্রথমে সম্পাদন করেছিলেন তা হল কিয়োটো প্রোটোকল থেকে আমেরিকাকে সরিয়ে আনা। তাঁর যুক্তি ছিল আমেরিকা কিয়োটো প্রোটোকল-এর শামিল হলে তার উন্নয়নের গতি শ্লথ হয়ে পড়বে (In 2001 one of the first acts of the newly elected President was the formal withdrawal of US from Kyoto. Bush said the US would not ratify the treaty because it would damage the American economy. Times of India 21.7.2005)। কী অদ্ভুত যুক্তি? সারা বিশ্ব যদি ধ্বংসের পথে যায় তাকে যেতে দাও। আমেরিকার অর্থনীতি যেন সুরক্ষিত থাকে। অথচ আমরা একটু আগে দেখলাম যে আমেরিকা ভারতের চেয়ে ১০গুণ বেশি দূষণ ছড়াচ্ছে। এমন স্বার্থপর দেশটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমেরিকা যে কেবল কিয়োটো প্রোটোকল থেকে নাম প্রত্যাহার করেছিল তা নয় এ সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় রাষ্ট্রসংঘের অনেক সদস্য ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর কিছু কিছু অংশ সংশোধনের নিমিত্ত সভা আহ্বানের প্রস্তাব দেয় এবং দুঃখের বিষয় হল আমেরিকা সেই সভায় যোগ দিতে অস্বীকার করে।

উন্নত দেশগুলি খুবই সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের কুফল যাতে ওইসব দেশের সর্বনাশ ডেকে আনতে না পারে তার জন্য তারা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপীয় সংঘ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যে পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস ছাড়ছে তার প্রভাব থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশ মুক্তি পাচ্ছে না। ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির পরিকাঠামো নেই নিঃসরণের কুফল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করা। রাষ্ট্রসংঘ চেয়েছিল বিশ্বের সমস্ত দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের অভিশাপ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় রাষ্ট্রসংঘের সেই প্রত্যাশা একেবারে পূর্ণ হয়নি। ২০১২ খ্রি.-এর মধ্যে কিয়োটো প্রোটোকল-এর শর্ত বা উদ্দেশ্যকে কার্যকর করতে হবে। গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড এবং তিন ধরনের ফ্লুরোনেটেড গ্যাস যেমন সালফার হেক্সাফ্লোরাইড, হাইড্রোফ্লুরো কার্বন এবং পারফ্লুরো-

কার্বন।[১] এরা সম্মিলিতভাবে গ্রিনহাউস গ্যাস বা এফেক্ট তৈরি করে, উন্নত দেশগুলি জানে যে তাদের উন্নয়নের হার উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের উন্নয়নের হারের চেয়ে অনেক বেশি এবং সে-কারণে তাদের আগে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা দরকার। চিন হল বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানাধিকারী এবং বিশ্বের যেসমস্ত দেশ কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ করছে তাদের মধ্যে চিনের স্থান দ্বিতীয়, অবশ্য চিন বলছে যে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ করা বা কমিয়ে ফেলা জরুরি। কিন্তু সমস্যা হল এই কাজ করতে হলে যে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তা সংগ্রহের সামর্থ্য উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলির না থাকায় তারা এগোতে পারছে না। গোলমাল এখানেই। উন্নত দেশ উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চাইছে না। ফলে সমস্যা দিনের পর দিন গভীরতর ও সংকটজনক হয়ে উঠছে। ভারত কিয়োটো প্রোটোকল-এ স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু প্রোটোকল-এ উপস্থিত দেশগুলি মনে করে যে ভারত, চিন প্রভৃতি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে এখনই কিয়োটো প্রোটোকলের বিধি-নিয়মের আওতায় আনার দরকার নেই কারণ শিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় তাদের আগমন অনেক বিলম্বে ঘটেছে। প্রোটোকল-এর নিয়ম ও নিষেধকে কার্যকর করার প্রধান দায়িত্ব হল উত্তরের উন্নত দেশগুলির।

গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ফল

গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ভয়ংকরতা নিয়ে বিশ্বজোড়া যে এত হইচই তার ফলাফল এখন কোথায় এবং ভবিষ্যতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত প্রয়োজন বলে মনে করি।

(১) বিশ্বের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন নিয়ে বিজ্ঞানীরা খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কারণ তাঁরা অনুসন্ধান করে জেনেছেন যে আর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে উত্তরমেরুর বরফ এমনভাবে গলতে শুরু করবে যার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের নীচু জায়গাগুলি বরফগলা জলে প্লাবিত হবে। কিছুদিন আগে[২] লন্ডনের বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন যে ২০১৩ খ্রি. নাগাদ উত্তরমেরুর বরফ গলে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অবশ্য সময় নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে সব বিজ্ঞানী একমত যে ২০৪০ খ্রি. নাগাদ উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর বরফ পরিষ্কার হয়ে যাবে। জনৈক সংবাদদাতা বলেছেন : The crucial point in that ice is not clearly building up enough over winter to restore cover. কোন্ বছর নাগাদ বরফ গলে যাবে সে-প্রশ্ন জরুরি নয়। সমস্যা হল উত্তরমেরুতে শীতকালে বরফ জমছে না। এই আশঙ্কা যে, এরকম চলতে থাকলে বরফের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

(২) বরফগলা জলে নদী-সমুদ্র প্রভৃতির সন্নিকটবর্তী জায়গাগুলির জলের পরিমাণ অসম্ভব বেড়ে যাবে এবং ইতোমধ্যে বাড়তে আরম্ভ করেছে। এই অসম্ভব জলস্ফীতির হাত থেকে মানুষের পক্ষে আত্মরক্ষা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। হিমালয়ের হিমবাহ (glacier) অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে জলে পরিণত হচ্ছে এবং এর ফলে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলের নীচু জায়গাগুলির জলের তলায় চলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। কোনো বৈজ্ঞানিক দক্ষতা তা রোধ করতে পারবে না।

(৩) বিশ্ব উষ্ণায়ন দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য উত্তর আমেরিকার অনেক বন-জঙ্গলে আগুন ধরতে আরম্ভ করেছে। উত্তর আমেরিকার একটি বড়ো সমস্যা হল এই দাবানল। কেবল উত্তর আমেরিকা নয় অন্যত্র এই দাবানল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। সাম্প্রতিককালের খবরে দেখা যাচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক জায়গায় দাবানল ভয়ংকর বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৪) প্রকৃতির রাজ্যে নানাপ্রকার বেনিয়ম বা খামখেয়ালি দেখা দিচ্ছে। যেমন উষ্ণায়নের দরুন কোথাও অতিবৃষ্টি এবং তজ্জনিত বন্যা। কোথাও খরা, কোথাও বা সাইক্লোন বা ঝড়, সুনামি ইত্যাদি। ২০০৪-এর ডিসেম্বর মাসে নজিরবিহীন সুনামির কবলে ভারতসহ বেশ কয়েকটি দেশ পড়ে এবং অসংখ্য লোকের প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়। আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল খরার শিকার হয়েছে যার থেকে দেখা দিয়েছে দুর্ভিক্ষ। মৎস্যচাষ ও পর্যটনের ক্ষতিকে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফসল বলে সবাই মনে করেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য যেসব জায়গার নামডাক ছিল সেগুলি ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায় পর্যটনশিল্প প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং যেসব দেশের অর্থনীতি পর্যটন শিল্পের ওপর নির্ভরশীল তারা সংকটের মুখে পড়েছে।

(৫) তীব্র তাপপ্রবাহ বিশ্বের নানা জায়গাকে গ্রাস করে ফেলছে। দক্ষিণ ইউরোপের অনেকখানি জায়গা এই তীব্র তাপপ্রবাহের কবলে পড়ে। জঙ্গলে জঙ্গলে আগুন লাগে, শস্যের উৎপাদন হ্রাস পায়। তাপপ্রবাহের জন্য চাষবাস ও অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য জলের যে চাহিদা তা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ তীব্র জল-সংকট দেখা দেয়। অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে জল-সংকট নজিরবিহীন আকার ধারণ করেছে বলে অভিজ্ঞমহল দাবি করেন। আবার এই দুই জায়গার উপকূলবর্তী এলাকা ভয়াবহ ঝড়ের কবলে পড়ে।

[১] আনন্দবাজার পত্রিকা ৩১/১২/২০০৭
[২] কলকাতা থেকে প্রকাশিত টাইমস অফ ইন্ডিয়ার ১২/০৮/০৮-এর তথ্য।

মজার ব্যাপার হল একই রাষ্ট্রের কোথাও বন্যা, কোথাও খরা, কোথাও ঝড় এবং কোথাও বা সাইক্লোন। প্রকৃতির এই বিচিত্র আচরণের জন্য দায়ী মানুষের অবিমৃশ্যকারিতা। উষ্মায়ন রোধ করতে না পারলে প্রকৃতির দস্যিপনা বন্ধ করা সম্ভব হবে না।

প্রকৃতির এই খামখেয়ালি সর্বত্র দেখা গেলেও অনেক উন্নত দেশ আর্থিক সামর্থ্য ও উন্নতমানের প্রযুক্তির সাহায্যে রক্ষা-কবচ বানিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলি কিন্তু সেই সুযোগ পায়নি। এই প্রসঙ্গে টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের কিয়দংশ তুলে দিলাম : Around the world, there are abundant examples of how wealth is already enabling some countries to gird against climatic and coastal risks while poverty, geography and history place some of the world's most crowded vulnerable regions directly in harm's way. সম্পদ বণ্টনকে মাপকাঠি করলে সারা বিশ্বকে দুটি প্রধান গোষ্ঠীতে ভাগ করা যেতে পারে। যেসমস্ত দেশের হাতে বিপুল সম্পদ জমা হয়েছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে তারা জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশদূষণকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু যারা এই সুযোগ পায়নি তারা কার্যত দুদিক থেকে আক্রান্ত। উন্নয়নের দিকে দ্রুত পায়ে অগ্রসর হতে পারছে না। কারণ দূষণের ভয়। আবার উন্নয়ন না হলে দেশের কতকগুলি মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। পিছিয়ে পড়ার জন্য উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলির সমস্যা দিনের পর দিন চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে।

বিশ্বের দ্বি-বিভাজনের বিষয়টি আমরা আগে অনেকবার উল্লেখ করেছি। এবার এই দ্বি-বিভাজনকে ভিন্ন প্রেক্ষিতে দেখা হল। উন্নত দেশগুলি উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের মাধ্যমে দূষণ রোধ করছে এবং সেইসঙ্গে উন্নয়নশীল দেশ-গুলিকে বলছে তারা যেন দূষণ না ছড়ায়। কিন্তু দূষণের বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য যা প্রয়োজন তা দিতে তারা প্রস্তুত নয়। এ যেন সেই উত্তর-দক্ষিণের লড়াই নতুন মাত্রা পেল, শিল্পায়নে আমেরিকা অনেকদূর এগিয়ে গেছে তবুও তার ক্ষিধে মেটেনি আরও চাই। সারা বিশ্ব ও মানবজাতি ধ্বংস হয় হোক সে শিল্পায়নের চাকাকে আমেরিকা অচল করবে না। পালটা যুক্তি দিয়ে বলছে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে দূষণ রোধে ব্যবস্থা নিতে হবে। একটি দৈনিক পত্রিকার শিরোনাম এইরকম ছিল : As the developed world builds its climate defences, the poor cousins are left to defend for themselves. Unequal world fights warming. সুতরাং বিশ্ব উষ্মায়ন আর-একবার বিশ্বকে দুটি ভাগে ভাগ করে দিল। বিশ্বের বিভাজন বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি আজ চরম সংকটের মুখে। শিল্পায়ন ব্যতীত তাদের বাঁচার বিকল্প পথ নেই। আবার শিল্পায়ন-জাত দূষণের মোকাবিলা করার সামর্থ্যও তাদের নেই। এই জাঁতাকলে তারা পড়েছে।

২০০৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সময়ে বিশ্বের নানা জায়গায় কিয়োটো প্রোটোকল এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মতবিনিময় হয়েছে। তবে ওইসমস্ত অধিবেশনে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। যা হয়েছে তা হল উত্তর বনাম দক্ষিণ এই বিতর্কটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আমেরিকা হল অন্যতম উন্নত দেশ যে কিয়োটো প্রোটোকল-এ স্বাক্ষর করেনি। এক অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়ে সে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাইছে। তার বক্তব্য হল যেসমস্ত দেশ নতুনভাবে শিল্পায়নের জোয়ার আনছে কেবল তারাই বেশি পরিমাণে দূষণ ছড়াচ্ছে এবং ভারত ও চিন হল এইসব দেশের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং আগে এরা দূষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। কিন্তু ভারত বলছে যে আমেরিকা ভারতের চেয়ে বেশি দূষণ সৃষ্টি করছে। যেমন ভারত যে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করে তার পরিমাণ মাথাপিছু এক টন। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ ২০ টন। সহজ প্রশ্ন হল গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ রোধের জন্য কার আগে এগিয়ে আসা উচিত? ক্ষমতা-দর্পী আমেরিকা গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ভয়াবহ পরিণতি বুঝতে চাইছে না অথবা বুঝলেও প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ে তোলায় অনীহাগ্রস্ত। ফলে বিশ্বের মানবজাতির সামনে বিরাট সংকট।

রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা

পরিবেশদূষণের অভিশাপ থেকে মানবজাতি ও সভ্যতাকে মুক্ত করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগ নিয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। এখানে দু-একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করব। পরিবেশের দ্রুত ক্রমাবনতিতে রাষ্ট্রসংঘ যে রীতিমতো উদ্‌বিগ্ন তার প্রমাণ পাওয়া যায় কয়েকটি কমিটি গঠনের মধ্যে। আগে আমরা ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ নামক সংস্থার কথা বলেছি। এতদ্‌ব্যতীত প্রোটোকল অন দ্য রিডাকশন অফ গ্রিনহাউস গ্যাসেস, কনভেনশন অন বায়োলজিকাল ডাইভারসিটি ইত্যাদি একাধিক কনভেনশন ও কমিটি গঠিত হয়েছে। এইসমস্ত কনভেনশন ও কমিটির বেশ কয়েকটি সম্মেলন বসেছে এবং এগুলিতে বিশ্বের সেরা সেরা পরিবেশবিজ্ঞানীরা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। পরিবেশকে দূষণের কবল থেকে মুক্ত করতে হলে কী কী করা প্রয়োজন তা নিয়েও বিজ্ঞানীরা আলোচনা করেছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কারণ পরিবেশদূষণকে ঘিরে বিশ্বে এক ধরনের নোংরা রাজনীতি হচ্ছে এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় হল সেই নোংরা রাজনীতির অবসান ঘটানোর দায়িত্ব রাষ্ট্রসংঘের ওপর কেউ অর্পণ করেনি এবং করলেও রাষ্ট্রসংঘ সফল হত না।

রাষ্ট্রসংঘে রাজনীতির অবসান ঘটাতে না পারলেও চেষ্টা চালিয়ে যেতে কসুর করেনি। এর অধীনে একটি প্যানেল গঠিত হয়েছিল যার লক্ষ্য ছিল বিশ্বের কোথায় কী পরিমাণ জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে এবং তার প্রতিক্রিয়া (impact) কী রকম তা দেখা বা বিশ্লেষণ করা। এই প্যানেল-এর নাম ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা সংক্ষেপে আই.পি.সি.সি.। এই প্যানেল-এর চেয়ারপার্সন হলেন ড. আর পাচৌরী। ২০০৭ খ্রি.-এ এই প্যানেলকে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এই প্যানেল ২০০৫ খ্রি. পর্যন্ত ২০০০ শীর্ষস্থানীয় জলবায়ু বিশেষজ্ঞ গবেষণা করে দেখেছেন যে বিশ্বের জলবায়ু অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে এবং তার বিরূপ প্রভাব সমাজের ওপর পড়ছে। বিজ্ঞানীরা প্যানেল-এর নিকট যে প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে যে ১৯০০ খ্রি. থেকে বিশ্ব ক্রমাগত উষ্ণ হচ্ছে এবং উষ্ণতার পরিমাণ ০·৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিশ শতকের ছয়ের দশকের আগে পর্যন্ত উষ্ণায়নের হার মোটামুটি তাই থাকলেও ছয়ের দশক থেকে উষ্ণায়নের হার অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্যানেল-এর বিজ্ঞানীরা যে তথ্য প্রদান করেছেন তার দিকে তাকালে পিলে চমকে যাওয়ার মতো অবস্থা হবে। বিজ্ঞানীদের মতে নয়ের দশকে উষ্ণায়ন যেভাবে হয়েছে তা নাকি গত এক হাজার বছরে হয়নি (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২১/২/২০০৫)। পর্বতের শিখরদেশে যে বরফ জমা ছিল তা দ্রুত জলে পরিণত হচ্ছে। আর তা ১০ শতাংশের মতো (The IPCC also found that snow cover since the late 1960's has decreased by about 10 percent and lakes and rivers in northern hemisphere are frozen over about two weeks less each year than they were then. Times of India 21.2.05). আই.পি.সি.সি. আরও আতঙ্কের কথা শুনিয়েছে। যদি বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রবণতা রোধ না করা যায় তাহলে এর ভয়াবহ ভবিষ্যৎ আমাদের সামনে দেখা দেবে। প্রবল বন্যা, ভয়ংকর ঝড়, তাপপ্রবাহ (heat waves), খরা ইত্যাদি দল বেঁধে আসবে। তাপমাত্রা এইভাবে বাড়তে থাকলে উন্নয়নশীল দেশগুলির সামনে বিরাট বিপদ অপেক্ষা করছে। আই.পি.সি.সি.-এর মতে উন্নয়নশীল দেশগুলি তুলনা-মূলকভাবে বেশি পরিমাণে উষ্ণায়নের শিকার হবে এই কারণে যে উষ্ণায়নকে প্রতিহত করার মতো তাদের সম্পদ ও প্রযুক্তি নেই। প্যানেল তার প্রতিবেদনে আরও বলেছে যে উষ্ণায়নের গতিরোধ করতে না পারলে উত্তরমেরুর বরফ দ্রুতগতিতে গলতে আরম্ভ করবে। এর ফলে নীচু জায়গাগুলি প্লাবিত হবে। সেইসঙ্গে বহু জীবজন্তু পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

অনুসন্ধান থেকে প্যানেল জানতে পেরেছে যে বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়ছে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের জন্য। গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ৭৫ শতাংশের বেশি আসছে কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে। কার্বন ডাইঅক্সাইড জন্ম নিচ্ছে খনিজ তেল পোড়ানো থেকে। অর্থাৎ যত বেশি গাড়ি রাস্তায় চলবে তাতে বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড গাড়িগুলি নিঃসরণ করবে এবং বায়ুদূষণ বাড়বে। আই.পি.সি.সি. তার একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলেছে যে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ রোধ করতে হলে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে উন্নয়নের হার শিথিল করতেই হবে। এই উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করছে ভারত ও চিন। কিন্তু সমস্যা হল এই দুই দেশের পক্ষে উন্নয়নের হার শিথিল করা একেবারে সম্ভব নয়। সুতরাং বিশ্বের উষ্ণায়নের গতি রোধ করতে হলে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) পরিমাণ অল্প মাত্রায় কমাতে হবে এবং উন্নতমানের যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হবে। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যকে কার্যকর করে তোলার জন্য যে ব্যয় হবে তা উত্তরের সমৃদ্ধিশালী দেশগুলিকে বহন করতে হবে।

পঞ্চদশ সার্ক সম্মেলন

২০০৮-এর আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে সার্ক-এর পঞ্চদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। একে অন্যান্য সম্মেলনের মতো একটি গতানুগতিক সম্মেলন বললে সঠিক মূল্যায়ন করা হয় না। জুন ও জুলাই মাসে ভারতের নানা অঞ্চলে বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী হানা ঘটে গেছে। ২০০৩-এর মার্চ থেকে ২০০৮-এর ২৫ জুলাই পর্যন্ত মোট ১৩ টি সন্ত্রাস-হানা ঘটেছে (সূত্র: ফ্রন্টলাইন আগস্ট ২০০৮ পৃ. ৮)। ওইসমস্ত হানায় মোট ৬০৬ জন মারা যায় এবং আহতের সংখ্যা বহুগুণ বেশি। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বেশ কয়েকটি জায়গায় সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম জনমনে ব্যাপক আতঙ্ক ও জীবন এবং ধনসম্পত্তি সম্পর্কে বিপুল পরিমাণ অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কেবল ভারত নয় পাকিস্তানে ও আফগানিস্তানে সন্ত্রাসমূলক কাজ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমানাস্থিত জায়গাগুলিকে সন্ত্রাসবাদীরা ও তালিবানরা মুক্তাঞ্চলে পরিণত করে ওইসব এলাকা থেকে ভারত ও আফগানিস্তানে সন্ত্রাস চালায়। আফগানিস্তানে ভারতীয় দূতাবাসের ওপর আক্রমণ চালিয়ে কয়েকজন দূতাবাস কর্মীকে হত্যা করে। মার্কিন দূতাবাসও বাদ পড়েনি। যে পাকিস্তানের আই.এস.আই. (ইন্টার সার্ভিস ইনটেলিজেন্স) এবং অন্যান্য জঙ্গি গোষ্ঠী পাক-সরকারের মদত পেয়ে আসছিল সেই পাকিস্তান শেষ-পর্যন্ত আত্মঘাতী বোমার কবলে পড়ে এবং বহু লোক প্রাণ হারায়। সর্বোপরি যে শ্রীলঙ্কায় পঞ্চদশ সার্ক সম্মেলন বসেছিল সেই শ্রীলঙ্কার সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি সমগ্র দ্বীপরাষ্ট্রটি তাদের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত করে ফেলেছে। ফলে